রাসূলুল্লাহর কর্মভিত্তিক সিরাত

সায়্যিদুনা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূল : ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদ : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

লেখকের কথা

আল্লাহ তায়ালা বলেন–‘আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।’[১]

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং যারা তাঁর হিদায়াতের অনুসরণ করে তাদের সবার ওপর। আম্মাবাদ,

মুসলিম আলিম, লেখক, প্রবন্ধকার, গল্পকার, পত্রকার, সংকলক, বক্তা, সাংবাদিক; এক কথায় প্রত্যেকের মনের একান্ত বাসনা–তারা তাদের লিখনিতে, গল্পে, প্রবন্ধে, সাময়িকিতে, গ্রন্থে, রেডিও টেলিভিশনের আলোচনায়; সাপ্তাহিক, ষন্মাসিক কিংবা বাৎসরিক বক্তৃতার মাহফিলে নবি সা. এর সিরাত নিয়ে আলোচনা করবে। তারা উপস্থাপন করবে নবিজির ব্যক্তি জীবন, বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠন প্রকৃতি, জীবন চরিত, পারিবারিক জীবন, সন্তানাদির সাথে কাটানো মুহূর্ত, দাওয়াতি জীবন, আখলাক এবং সেই অনন্য রিসালাতের বর্ণনা; যা নিয়ে তিনি বিশ্বাবাসীর কাছে আগমন করেছেন। যাতে মহান ও প্রশংসিত রবের অনুমতি সাপেক্ষ তাদের নিয়ে আসতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোতে।

---

1 সূরা আম্বিয়া : ১০৭

উসুলুদ দ্বীন অনুষদের ছাত্র থাকাবস্থায় আমি ইসলাম নিয়ে লেখার জন্য কলম ধরেছি। এ সময় আমি বেশ কয়েকটি ছোটো পুস্তিকা লিখেছি। উদাহরণত *কুতুফুন দানিয়া*। এটি ছিল আমার প্রথম পুস্তিকা। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শায়খ আল ইমামুল আকবার মাহমুদ শালতুত রহ. এর অনুরোধে আমি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছিলাম। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আস সিকাফাতুল ইসলামিয়্যা বা ইসলামি সভ্যতা শীর্ষক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আ. দ. মুহাম্মাদ আলবাহি রহ. এর অনুরোধে *আল হারাম ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম* নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। অবশ্য এ গ্রন্থের নাম শুরুতে এটি ছিল না। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, একজন মুসলমানের জন্য যা কিছু হারাম এবং হালাল সে বিষয়ে একটি গ্রন্থ লিখে দিতে। আমি এ গ্রন্থটি লিখেছিলাম হানাফি মাজহাবের *আল হাজার ওয়াল ইবাহা (الحظر والإباحة)* নিষিদ্ধ ও বৈধ বিষয়ের আলোকে।

আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল *আল ইবাদাতু ফিল ইসলাম*। তৃতীয় গ্রন্থটি ছিল *আল ঈমান ওয়াল হায়া*। এরপর আমি ধারাবাহিকভাবে একেকটি বিষয় ধরে ধরে লেখা শুরু করি। আল্লাহ তায়ালা আমার লেখনিতে প্রচুর বরকত দান করেন। আমি পর্যায়ক্রমে লিখতে থাকি আকিদা, ফিকহ, উসুল, ফতোয়া, কুরআন, সুন্নাহ, ইসলামি শিষ্টাচার, সিরাত, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, ইসলামি চেতনা, ইসলামি আন্দোলন, মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ব, ইসলামের নেতৃত্বদানকারী

বিভিন্ন দলের মতবিরোধিতা, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের শক্তিহীন ও অক্ষম করার মিশনসহ নানা বিষয়ে।

আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন একটি কলম দান করেন, যা রাব্বানিয়ার শক্তিতে শক্তিমান। আল্লাহর অশেষ সাহায্যে এর মাধ্যমে আমি ইসলামে শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হই। তাদের আস্তানায় পূর্ণ শক্তিমত্তা দিয়ে আঘাত হানি। বর্শার ধারালো ফলা তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঢুকিয়ে দিই। যাতে সত্যের কালিমা সমুন্নত হয়। কল্যাণ ও হিদায়াতের পথ চির উন্নত হয়; যার জন্যই ইসলাম এসেছে। কুরআন নাজিল হয়েছে। আর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের সুন্নাহ যে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছে। যা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্য দণ্ডয়মান হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীগণও একনিষ্ঠভাবে তা বাস্তবায়ন করে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ইসলামি ফিকহ নিয়ে আমার উদ্ভাবিত রীতিতে বহু গ্রন্থ লিখব। যদিও সে রীতিটি একান্তই আমার সৃষ্টি নয়। তাই আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে এমন কোনো নতুন রীতি উদ্ভাবন থেকে রক্ষা করেছেন ইসলামে যার কোনো উৎস ও ভিত্তিমূল নেই। আমার আরও আকাঙ্ক্ষা ছিল, ইসলামের যতো বিষয়ে কলম ধরা প্রয়োজন, আমি তার প্রত্যেক বিষয় নিয়েই লিখব। তাতে আমি সুদৃঢ় নস, বিধায়ক উসুল, পথপ্রদর্শক মাকাসিদ, বিজ্ঞ নীতিমালা ইত্যাদির সন্নিবেশ ঘটাবো; আমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছে কুরআন ও

সুন্নাহ। আর আমি তা লিখব খুব সহজ ভাষায়। বর্ণনার রীতিও হবে সাবলিল। যাতে তা বুঝতে কারও কষ্ট না হয়। এমনকি যারা ইসলামের শত্রু, তারাও তা উপলব্ধি করতে পারে সহজেই।

আমি আল্লাহর অযুত প্রশংসা করছি। ইতোমধ্যেই তাঁর তাওফিকে আমি এমন অনেক গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছি, ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে যা আলিম, মুত্তাকি, লেখক ও শিক্ষাবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যেমন *ফিকহুজ জাকাত, ফিকহুল জিহাদ* ইত্যাদি। আকিদা, ফিকহ ও উসুল বিষয়েও আমি গ্রন্থ লিখেছি। আরও লিখেছি দাওয়াত, তাসাওউফ, শরয়ি রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, তাফসির, হাদিস, ইতিহাস, জীবনের বাস্তবতা, সাহিত্য, কবিতাসহ আরও নানা বিষয়ে। আর এসব গ্রন্থ দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

এতো গ্রন্থ রচনার পরেও আমার মনের একান্ত বাসনা, আমাদের রাসূল সা. এর সিরাত নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করব। যাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আর তার শানে বলেছেন– 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'[২] আল্লাহ তায়ালা তার রিসালাতকে করেছেন বিশ্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী।

---

2 সূরা আম্বিয়া : ১০৭

তাঁর মতো তার আনীত রিসালাতও সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ।

আমি প্রথমে মনে মনে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু পরিকল্পনা করেছি। এর পরিচ্ছেদ ও শিরোনামগুলোর বিন্যাস করেছি। যাতে আমার গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে পঞ্চদশ হিজরির উপযোগী হয়ে উঠে। আর গ্রন্থটির নাম দিয়েছি *মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি লিল আলামিন*। এর মাধ্যমে আমি কুরআনের একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছি। যাতে নবি সা. কে বিশ্ব রাসূল করে পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'[৩]

এরপর আমি গ্রন্থটি লেখায় মনোনিবেশ করি। এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখে ফেলি। যাকে এ গ্রন্থের প্রাণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু এটি লেখা শেষ করার আগেই আমাকে অন্যকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়।

আসলে আল্লাহই তো বান্দাকে নানা কাজে ব্যস্ত করে দেন। আর কোনো কাজ তার সিদ্ধান্ত ছাড়া বাস্তবায়নও হয় না। অতএব এমন কিছু কাজ বাকি থাকে যা গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করবে। আর বুদ্ধিবৃত্তিকে চমৎকৃত করবে।

নবি সা. এর মোবারক সিরাত নিয়ে বিশ্বব্যাপী মিলিয়ন মিলিয়ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বরং বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রন্থ রচিতি হয়েছে বললেও ভুল হবে না। আর তা লিখেছেন বিলিয়ন বিলিয়ন

---

3 সূরা আম্বিয়া : ১০৭

লেখক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। তাদের মধ্যে এমন লেখকের সংখ্যাও কম নয় যারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে সিরাত বর্ণনা করেছেন।

এই লেখকদের একটি অংশ হলো আরব। যারা বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় উন্নত সাহিত্য মানে সিরাত রচনা করেছেন। অবশ্য তাদের কেউ লিখেছেন দীর্ঘ সিরাত। আবার কেউ সংক্ষেপিত। কেউ লিখেছেন নবিজির ধারাবাহিক জীবন চরিত। কেউ লিখেছেন বিশ্লেষণধর্মী। কেউ আবার জীবনের একটি দিক নিয়ে কেবল আলোচনা করেছেন। সেই একটি দিকেরই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তার পক্ষে বিপক্ষে যতো যুক্তি রয়েছে তাও তুলে ধরেছেন। আবার কেউ জীবনের প্রত্যেকটি দিকই বিশ্লেষণমূলকভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আলোচনা করেছেন অতি উত্তম। নবি জীবনের একটি অংশের আলোচনাও তারা বাদ দেননি।

আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক লেখক নবি জীবনের সেই অংশ নিয়েই আলোচনা করেছেন, যা তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আর সে বিষয়ের প্রতিই তিনি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হয়েছেন। সে বিষয়টিকে তিনি এমনভাবে খোলাসা করেছেন, যেমনটা তিনি ছাড়া আর কেউ পারেনি।

আমরা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কে দেখতে পাই। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল সাগরের প্রবহমান পানির মতো। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। তিনি *জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ* গ্রন্থে রাসূল সা. এর ব্যক্তি জীবন,

নবুওয়াতি জীবন, মাক্কি জীবন, মাদানি জীবন, দাওয়াতি জীবন, জিহাদি জীবন, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, ইবাদতি জিন্দেগী, পারস্পারিক রীতিনীতি, দিকনির্দেশনা, শরিয়াতি জীবন, শান্তি অবস্থা, যুদ্ধাবস্থা ইত্যাদির সবকিছুই অত্যন্ত বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি উদ্বৃত্ত করেছেন অনেক সুন্নাহ, আহকাম ও আদাব-শিষ্টাচারের বর্ণনাও।

তার বর্ণিত এসব বিষয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যস্ত করে তোলে। হৃদয়গুলোকে আলোকিত করে। ব্যক্তিত্ববোধকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে কল্যাণ ও হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে। আর তাদের মাঝে এমন সঙ্কল্প বদ্ধমূল করে দেয়, যার সাহায্যে তারা মানুষকে সবচেয়ে সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করে। যে পথের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–'আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ করো। আর নানান পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদের তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাকে ভয় করে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারো।'[৪]

আধুনিক যুগের অনেক দাঈ ও ইসলামি ব্যক্তিত্বও নবি সা. এর সিরাত নিয়ে কলম ধরেছেন। আর প্রত্যেকেই সিরাতের এমন অংশ নিয়ে লিখেছেন যা তার কাছে সহজবোধ্য হয়েছে। তাদের কেউ কেউ নবি সা. এর সামগ্রিক জীবন নিয়ে লিখেছেন। আর এক্ষেত্রে তারা শায়খ মুহাম্মাদ গাজালি রহ. এর *ফিকহুস সিরাত*

---

4 সূরা আনয়াম : ১৫৩

গ্রন্থের রচনা পদ্ধতির অনুকরণ করেছেন। অবশ্য এ পদ্ধতিতে আগেও অনেকে গ্রন্থ লিখেছেন। যেমন : শায়খ মুহাম্মাদ আল খাজারি লিখেছেন *নুরুল ইয়াকিন*। ড. মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কল লিখেছেন *হায়াতু মুহাম্মাদ*। অবশ্য মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কলের সিরাতটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শায়খ ইমাম মুহাম্মাদ মুসতাফা আল মারাগি রহ.।

এই ধারাবাহিকতায় ড. ত্বহা হোসাইন লিখেছেন *আলা হামিশিস সিরাত*। শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি লিখেছেন *আস সিরাতুন নববিয়্যা*। তিনি এ গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদদের লেখা সিরাত অধ্যয়নের পর লিখেছিলেন।

আলি হাসান নদবির পূর্বে নদওয়াতুল উলামার অনেক আলিম সিরাত নিয়ে উর্দু ভাষায় লেখালেখি করেছেন। তন্মধ্যে অনেকে একাধিক খণ্ডের সিরাতও লিখেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আল্লামা সোলাইমান নদবি। তিনি আট খণ্ডে একটি সিরাত লিখে নাম দিয়েছেন *আর রিসালাতুল মুহাম্মাদিয়্যা*। ইরাকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাদ উদ্দিন খলিল রহ. লিখেছেন *দিরাসাতুন ফিস সিরাত*। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ সাদেক আরজুন রহ. চার খণ্ডের একটি সিরাত লিখে নাম দিয়েছেন *মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহি মানহাজ ওয়া রিসালাত*।

মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজদি রহ. আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক থাকাকলে এর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় নবি সা. এর সিরাত নিয়ে লিখেছেন। তার লেখার শিরোনাম ছিল *আস সিরাতুন নববিয়্যা তাহতা জাওয়িল ইলমি ওয়াল ফালসাফা*। প্রখ্যাত খ্রিস্টান লেখক নাজমি লুকা লিখেছেন *মুহাম্মাদ আর রাসুল ওয়ার রিসালাত*। এ সিরাতে বিশেষভাবে নবি সা. এর পারিবারিক জীবন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

লেখকদের অনেকে পূর্ববর্তী সিরাতকারদের হুবহু অনুসরণে সিরাত লিখেছেন। উদাহরণত ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং ইবনে কাসিরের লেখা সিরাতের অনুকরণ করেছেন। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল্লামা সফিউদ্দিন মোবারকপুরী। তিনি লিখেছেন *আর রাহিকুল মাখতুম*।

অনেকে আবার শুধুই রাসূল সা. এর স্ত্রীদের জীবনী লিখেছেন। যেমন : খাদিজা, আয়িশা কিংবা অন্য উম্মুল মুমিনিদের জীবন। আবার কেউ কেউ লিখেছেন কতক সাহাবির জীবন চরিত। যেমন : আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা.। কোনো কোনো লেখক নবি জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করেছেন।

প্রখ্যাত লেখক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ *আবকারিয়্যাতু মুহাম্মাদে* নবিজিকে সমর নায়ক, সত্যবাদী, নেতা, বাবা, দাদা ও নানা ইত্যাদি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একজন মুসলিম ও অমুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে নবিজির যেসব গুণাবলি ও কৃতিত্ব

রয়েছে, তিনি অত্যন্ত সাবলিলভাবে এ গ্রন্থে তার বর্ণনা উত্থাপন করেছেন।

আমাকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, আমি যেন শায়খ গাজালির *ফিকহুস সিরাত* গ্রন্থের আলোকে একটি সিরাত লিখে দিই। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, শায়খ গাজালির কিতাবের মতো কিতাব লেখা আমার মতো আরবের জন্য খুবই কঠিন কাজ। এ কিতাব লেখার পুরো সময় শায়খ গাজালি মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় ঐশ্বী আলো তাকে নুরান্বিত করে। অনেক রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হয়। তার এ কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য মানুষকে উপকৃত করেন। আমিও ছিলাম সেসব মানুষের একজন।

তাই আমি তার কিতাবের অনুরূপ সিরাত লেখা অপছন্দ করলাম। কারণ, তার কলম ছিল আমার কলমের চেয়ে শক্তিশালী এবং উত্তম। তার হৃদয় ছিল আমার হৃদয়ের চেয়েও প্রশস্ত। তার সাহিত্য ছিল আমার সাহিত্যের চেয়েও উন্নত।

তবে আমি এক্ষেত্রে উস্তাজ আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের অনুকরণ করলাম। আমার মনে মুহাম্মাদি সিরাতের এমন কিছু বিষয় উদ্ভাষিত হলো, যা দেখে দৃষ্টিরা দীপ্তিময় হয়, হৃদয়গুলো বিস্মিত হয়, জ্ঞানীরা হয় আশ্চর্যে চমকিত। বুদ্ধিজীবিরা তা দিয়ে হয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। আমি রাসূল সা. এর জীবনের মোট ১৪টি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে বিষয়গুলো হলো—

রাসূল ইবাদাতকারী

রাসূল দুনিয়া বিমুখ
রাসূল দাঈ
রাসূল বিশুদ্ধভাষী
রাসূল শিক্ষক
রাসূল মুজাহিদ
রাসূল সেনাপ্রধান
রাসূল ব্যক্তি ও মানুষ
রাসূল জাওকে সালিমের অধিকারী
রাসূল স্বামী
রাসূল বাবা ও নানা
রাসূল উন্নত চরিত্রের অধিকারী
নবিজি শরীরচর্চাকারী
বিশ্ব রাসূল

এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই এমন, যার কাছে অবস্থান করা যায়। যা নিয়ে বিস্তর লেখা যায়। যা নিয়ে লেখালেখি করার জন্য কলম যোদ্ধাদের উন্মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়। সবশেষে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তার বিশেষ মদদ দ্বারা এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করেন। আত্মিক মনোবল বাড়িয়ে আমাকে সাহায্য করেন। আর এমন চোখে আমাকে তত্ত্বাবধান করেন, যা কখনো ঘুমায় না।

সবশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করছি, আমার এই লিখনি দিয়ে যেন তিনি আমাকে, আমার সন্তানাদিকে, আমার ভাই ও বন্ধুগণকে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম উম্মার এক বিরাট

অংশকে উপকৃত করেন। এর মাধ্যমে যেন মুসলমারা উজ্জীবিত হয়। আর উপকৃত হয় অমুসলিমরাও। আমিন!

রবের কাছে ক্ষমার ভিখারি

ইউসুফ আল কারজাভি

বৃহস্পতিবার, ২৭ই সফর, ১৪৩৯ হিজরি

১৬ই নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

রাসূল ইবাদতকারী

আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সবকিছুর স্রষ্টা। জীবনদাতা। বড়ো থেকে বড়ো নিয়ামতদাতা। আর এ নিয়ামত ভোগের ক্ষেত্রে আদমসন্তানরা সবার অগ্রে।

শুরুতে এ বিশ্বজাহান কিছুই ছিল না। আল্লাহ যতদিন চেয়েছেন, এভাবেই কেটে গেছে যুগের পর যুগ। আর তা কয় যুগ ছিল, তার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এরপর আল্লাহ তায়ালার পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে হলো। অতএব, তিনি বিশ্বজাহান সৃষ্টি করলেন। অবশ্য এ কথাও বলা যায়, তিনি জমিনে ও আসমানে অগণিত বিশ্ব ও অসংখ্য জাহান সৃষ্টি করলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন—'শুধু আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর। তিনি প্রথমে জিকিরে (লাওহে মাহফুজে) সবকিছু লিখলেন। এরপর সৃষ্টি করলেন আসমান ও জমিন।'[৫]

আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন, যেন মানুষ তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে। তাঁকে চিনতে পারে। আর স্বীকার করে—তাদের ওপরে-নিচে, সামনে-পেছনে, ডানে-বামে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর রয়েছে একজন স্রষ্টা। তিনি শক্তি ও ক্ষমতায় মহীয়ান।

---

[৫] সহিহ বুখারি : ৩১৯১

জ্ঞানে গরীয়ান। তিনি জানেন যা সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি করা হবে। আর যারা তাঁর ইবাদত করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা কেবলই আমার ইবাদত করে।'[৬]

ইবাদত হলো, হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করার নাম। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা, যথাযথ অধিকার, আসমাউল হুসনা, সুউচ্চ গুণাবলি ইত্যাদি পূর্ণরূপে জানা ছাড়া এই ইবাদত করা যায় না। তাই তো ইমাম মুজাহিদ (রহ.) 'যেন তারা কেবলই আমার ইবাদত করে'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেন তারা যথাযথভাবে আমাকে চিনতে পারে।[৭]

এটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ একটি কথা। কারণ, ব্যক্তি যদি না জানে কার ইবাদত করছে, তাহলে সে যথাযথভাবে ইবাদত করতে সক্ষম হবে না। এমনকি হতে পারে, সে অন্যের ইবাদত করছে; অথচ তা সে জানেই না। বাস্তবেও অনেক ধর্ম ও মতবাদের মানুষ ধারণা করে, তারা আল্লাহর ইবাদত করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রকৃত ইলাহের পরিচয়ই তারা জানে না। ফলে তাদের ইবাদতও প্রকৃত ইলাহের আরাধনা হিসেবে গণ্য হচ্ছে না।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো আল্লাহর পরিচয় জানা।

---

[৬] সূরা জারিয়াত : ৫৬

[৭] *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি* : ১৫০৬

আল্লাহকে চেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আল্লাহই সাত আসমান বানিয়েছেন আর ওগুলোর মতো পৃথিবীও, সবগুলোর মাঝে নেমে আসে আল্লাহর নির্দেশ—যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ (স্বীয়) জ্ঞানে সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।'[৮]

অতএব, সুবিশাল সপ্ত আকাশ ও সুবিস্তীর্ণ জমিন সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন তাঁকে চিনতে ও জানতে পারে। জগদ্‌বাসী আল্লাহর নিদর্শন, কর্ম ও সৃষ্টি দেখে তাঁর সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে, আসমান-জমিনসমূহের একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছে। সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দলিল হিসেবেই তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-জমিনসমূহ।

আমাদের চোখে যা সবচেয়ে বড়ো দেখায়, আর যা সবচেয়ে ক্ষুদ্র; সবকিছুর ওপরই আল্লাহ ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে অবহিত। এমনকি সবচেয়ে বড়ো থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের সবকিছু কখন কোন অবস্থায় থাকে, তা সম্পূর্ণ তাঁর নখদর্পণে। এর কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে যেতে পারে না। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'যাতে তোমরা জানতে পারো—আল্লাহ সবকিছুর

---

[৮] সূরা তালাক : ১২

ওপর ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ তায়ালা (স্বীয়) জ্ঞানে সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।'[৯]

আল্লাহ তায়ালা জগৎসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাঁর পূর্ণতা, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের গুণ সম্পর্কে সৃষ্টিজগৎ ভালোভাবে অবহিত হতে পারে। সূরা আর-রহমানের শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের নাম বড়োই কল্যাণময়।'[১০]

সূরা আর-রহমানের শুরুর দিকেও আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে তাঁর কিছু গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—'অনন্ত করুণাময় আল্লাহ। তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই তাকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। তৃণলতা গাছপালা তাঁরই জন্য সিজদাবনত। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড। যাতে তোমরা ওজনে সীমালঙ্ঘন না করো। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।'[১১]

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-কে যখন দুনিয়ায় পাঠান, মানুষ ছিল বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। তাদের পথও ছিল আলাদা আলাদা। তাদের অবস্থান ছিল আল্লাহর পথ থেকে বহু ক্রোশ দূরে। ইলাহ ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা ছিল

---

[৯] সূরা তালাক : ১২

[১০] সূরা আর-রহমান : ৭৮

[১১] সূরা আর-রহমান : ১-৯

বহুধাবিভক্ত। তাদের কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করত। কেউ আবার ইলাহ সাব্যস্ত করত কিছু মানুষকে। আবার কেউ জড়বস্তুকে গ্রহণ করত ইলাহ হিসেবে। ছিল বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীও। এক আল্লাহর পরিবর্তে তারা এসব মিথ্যা ইলাহের ইবাদত করত।

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি মানুষের সামনে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য তিনি যেন মেলবন্ধনের অনুপম সাঁকো। তিনি পথপ্রদর্শক। সেই পথ দেখান, যাতে মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহকে চিনতে পেরে তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি ছাড়া যা আছে, কোনো কিছুই মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়; বরং তারাও মানুষের মতোই মাখলুক, রিজিকপ্রাপ্ত ও প্রতিপালিত।

মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে সত্য বাণীসংবলিত একটি কিতাব নিয়ে এসেছেন। সে কিতাবের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সরল পথের দিশা দেন। তাদের পথ, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবিয়্যিন, সিদ্দিকিন, শহিদিন ও সালেহিনের মাধ্যমে। আর সঙ্গী হিসেবে তারা কতই-না উত্তম!

এ পথের সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন হলো, আল্লাহর যথাযথ পরিচয় লাভ করা। তাঁর নাম ও সিফাতসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা। তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। অত্যন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। আর দ্বিতীয় নিদর্শন হলো,

কেবল তিনিই সমস্ত হামদ ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। দুআ ও প্রার্থনা পাওয়ারও একমাত্র অধিকারী। মানুষ, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির কোনো কিছুই তাঁর শরিক নয়। অংশীদার নয় তাঁর ক্ষমতার ও প্রভুত্বের; মানুষ যার ইবাদত করতে পারে কিংবা পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে পারে। কেবল তিনিই সাহায্য ও সহযোগিতার চূড়ান্ত ও পূর্ণ উৎস। তিনি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই।

মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠানো হয়েছে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ বিশুদ্ধ ও পবিত্র করার উদ্দেশ্যে। কারণ, তারা ধর্মের নামে গাইরুল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করেছিল। আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে প্রতিপালক ও ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। খ্রিষ্টানরা আল্লাহর একত্ববাদকে পরিবর্তন করেছিল বিতর্কিত ত্রিত্ববাদে। ইহুদিরা আল্লাহর পবিত্রতাকে প্রতিপাদনে রূপান্তর করেছিল। এ কারণেই তো নবিজি দুনিয়ার উমরা, শাসক ও অহংকারীদের এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন—'বলো, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে বাক্যের প্রতি—যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না, কোনো কিছুকেই তাঁর অংশী করব না এবং আমাদের কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে অপর কিছু লোককে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না।'[১২]

---

১২ সূরা আলে ইমরান : ৬৪

এ বক্তব্যটিই কুরআনের সর্বত্র বিস্তৃত। তবে তা সবচেয়ে সুন্দরভাবে আল কুরআনের প্রথম সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আর প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে মুসলমানদের তা তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাধারা, আবেগ, অনুভূতি, মানসিকতা ইত্যাদির সবকিছুই এ মর্মের ছায়াতলে প্রতিপালিত হয়। এই সূরায় বিবৃত হয়েছে—'যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিবসের মালিক। (হে আল্লাহ) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট নয়।'[১৩]

এ সূরার তিলাওয়াত আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার ওপর ফরজ করেছেন। আর রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন রাত ও দিনের প্রত্যেক নামাজে কমপক্ষে ১৭ বার এ সূরা তিলাওয়াত করে।

যৌবনের ইবাদত

মুহাম্মাদ (সা.) কেবল এমন শিক্ষক ছিলেন না; যিনি মানুষকে শুধু শেখাবেন, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়। কিংবা তিনি এমন কোনো পথপ্রদর্শক ছিলেন না; যিনি কেবল গন্তব্যে যাওয়ার পথ দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন। বরং যারাই যথাযথভাবে

---

[১৩] সূরা ফাতিহা : ১-৭

আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, সর্বত তাকওয়া অবলম্বন করে জীবন পরিচালনা করতে আগ্রহী, তাদের সবার জন্য তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ ও নমুনা।

মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর পথে চলা অগ্রগামী ব্যক্তি। যারাই যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে আগ্রহী, তাদের দায়িত্ব হলো মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আর নিশ্চিতভাবেই তুমি সরল-সঠিক পথপ্রদর্শন করছ। যা কিছু আকাশে আর জমিনে আছে, এসবের মালিক সেই আল্লাহর পথে। শুনে রাখো! সবকিছু আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে।'[১৪]

এটি শুধু ভালোবাসার দাবি কিংবা অনুসারী হয়ে অনুসৃতের পক্ষপাতিত্বও নয়। কেউ ইনসাফের সাথে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সিরাত অধ্যয়ন করল। সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য—তাঁর জীবন-চরিত্রে প্রতিটি মুহূর্তই দ্বীনের সত্যায়নকারী। আর তা এ কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহকে যতটা চিনতেন ও জানতেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কেউই তৎসমতুল্য নন। তাঁর ইবাদতের সমতুল্য পূর্বেও কেউ ছিল না, পরেও আর হবে না। আর এ বিষয়টি এতটাই বাস্তব, তা কোনোভাবেই গোপন করা যায় না। কোনো মেঘের আস্তরণই তাঁর আলোকে আটকে রাখতে পারে না।[১৫]

---

[১৪] সূরা শুরা : ৫২-৫৩

[১৫] শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি, *ফন্নুদ দুআ ওয়াজ জিকর*, পৃ. ৭

নবুয়তপূর্ব মুহাম্মাদ

মুহাম্মাদ (সা.) যৌবনের শুরুলগ্ন থেকেই আল্লাহর ইবাদত করতেন। তখনও তাঁর ওপর ওহি নাজিল হয়নি। দেওয়া হয়নি রিসালাতের দায়িত্ব। তাঁর সমকালে লোকেরা জাহেল ছিল। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন কথিত দেব-দেবীকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করত। এসব মিথ্যে প্রভুর মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর সামনে নুয়ে পড়ত সিজদায়। বিপদের সময়ও তাদের শরণাপন্ন হতো। কায়মনোবাক্যে তাদের কাছেই চাইত সব ধরনের সহযোগিতা। দুর্যোগে তাদের সাথে পরামর্শ করত। তাদের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করত বিভিন্ন পন্থায়।

সে যুগের বড়োরা যেসব অনর্থক ও গর্হিত কাজে অংশগ্রহণ করত, নবিজি তাঁর কোনোটিতে অংশ নেননি। একইভাবে ছোটোরা যেসব কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনি তাঁর কোনোটির প্রতি আকৃষ্ট হননি; বরং শৈশব থেকেই সমবয়সিদের মাঝে তিনি ছিলেন বেশি বুদ্ধিমান। ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি এবং পরিপক্ব বোধের অধিকারী। এজন্য তিনি কখনো কুরাইশদের কিংবা অন্য কোনো গোত্রের কথিত ইলাহের পূজা করেননি। জাহেলি যুগের কোনো খেলাধুলায়ও অংশ নেননি।

সমবয়সি যুবকরা যেখানে অহেতুক খেলাধুলা ও নির্লজ্জ বিনোদনে মত্ত হতো, নবিজি এর কোনোটিতে লিপ্ত হননি। তিনি বরং মানুষের মাঝে সবচেয়ে সত্যবাদী ও আমানতদার ছিলেন। হুরুমাতের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতেন। জুলুমের

প্রতিরোধ করতেন। তাঁর জীবনচরিত ছিল এমনই সুগন্ধময়। এমনই উৎকৃষ্ট গুণের সমাহারে সমুজ্জ্বল।

এ কারণেই খুব দ্রুত তাঁর এই গুণগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি তাঁর এই মহৎ গুণের কথা কুরাইশ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত নারীর কানেও পৌঁছায়। যে নারী ছিল বংশমর্যাদা ও ধনসম্পদে সবার মাঝে প্রসিদ্ধ। সে নবিজিকে অংশীদারি ব্যাবসার প্রস্তাব দেয়। নবিজি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন। সেই মহীয়সী নারীর নাম ছিলেন খাদিজা (রা.)। নবিজি ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে খাদিজাকে প্রচুর সম্পদের অধিকারী করেন। তাঁর জন্য প্রচুর কল্যাণ বয়ে আনেন।

মায়সারা ছিলেন খাদিজার বিশ্বস্ত একজন দাসী। বাণিজ্য সফরে সে ছিল নবিজির সঙ্গী। সফর থেকে ফিরে সে খাদিজার কাছে নবিজি সম্পর্কে বর্ণনা করে। খাদিজা জানতে পারে নবিজির উন্নত গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা এবং সফরে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাসমূহ। এতে খাদিজা নবিজির প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি নবিজির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যুবক মুহাম্মাদ এমন এক নারীকে বিয়ে করেন, যে তাঁর চেয়ে বেশি বয়স্কই শুধু ছিল না; বরং তিনি ছিলেন অনেকগুলো সন্তানের জননী।

ওহি নাজিল

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি মক্কার গারে হেরায় নির্জনে ধ্যানমগ্ন সময়

কাটাতেন। এর জন্য তিনি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতেন। কয়েক দিনের খাবার-পানীয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। খাবার ফুরিয়ে গেলে খাদিজার কাছে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবার প্রস্তুত করে নবিজির হাতে তুলে দিতেন। কখনো কখনো আবার খাদিজা নিজেও খাবার নিয়ে চলে যেতেন হেরা গুহায়।[১৬]

হেরা গুহার নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন সেই ফেরেশতা আসেন, যাকে তিনি এর আগেও স্বপ্নে দেখেছিলেন।[১৭] বাস্তবে সেই ফেরেশতাকে দেখে নবিজি কিছুটা ঘাবড়ে যান। প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েন। ফেরেশতা নবিজিকে শক্ত করে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, পড়ো। কিন্তু নবিজি বলেন, আমি পড়তে পারি না। তাঁদের দুজনের মধ্যে এমন কথোপকথন হয় কয়েকবার। এরপর ফেরেশতা নবিজিকে বুকের সাথে চেপে ধরে ছেড়ে দেন এবং বলেন—'পড়ো তোমার প্রভুর নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। আর পাঠ করো, তোমার রব বড়োই অনুগ্রহশীল। যিনি

---

[১৬] সহিহ বুখারি : ০৩; সহিহ মুসলিম : ১৬০

[১৭] এখানে একটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উবায়েদ ইবনে উমাইর (রা.) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি প্রথমাবস্থায় জিবরাইলকে স্বপ্নে দেখেছেন। স্বপ্নেই তিনি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নবিজিকে তিলাওয়াত করে শোনান। এরপর নবিজি সজাগ থাকা অবস্থায় জিবরাইল হেরা গুহায় এসে উপস্থিত হন। দ্র. *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ১/৩৩৬-৩৩৭

কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'[১৮]

এরপর ফেরেশতা চলে যায়। আর মুহাম্মাদ (সা.) ছুটে আসেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার কাছে। এ সময় তিনি ভয়ে কম্পান এবং অজানায় আশঙ্কায় তটস্থ। তিনি খাদিজাকে বলেন—'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'[১৯]

এ ঘটনায় নবিজি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খাদিজা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভার, নির্ভয় ও আশ্বস্ত। তিনি তো এমন কিছুর জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কেননা, তিনি তাওরাতে জানতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ নবির বৈশিষ্ট্যসমূহ। তাই আশা রাখতেন, এই মুহাম্মাদই হতে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সে নবি ও রাসূল। সদ্য ওহিপ্রাপ্ত নবির এমন কথা শুনে একটুও ঘাবড়ালেন না এই বিদুষী নারী। আশ্বস্ত করে বললেন—'হে আমার প্রিয়তম স্বামী, আপনি এ ঘটনাকে সুসংবাদ মনে করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সব সময় সত্য বলেন। অন্যের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন। মেহমানকে আপ্যায়ন করেন। সত্যের পক্ষ্যে দুর্যোগগ্রস্ত ও বিপদে পড়া মানুষদের সহযোগিতা করেন।'[২০]

---

[১৮] সূরা আলাক : ১-৫

[১৯] সহিহ বুখারি : ০৩; সহিহ মুসলিম : ১৬০

[২০] সহিহ বুখারি : ৩